بسم الله الرحمن الرحيم

# যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল-খামেস (আই.)-এর ২৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ মোতাবেক ২৭ তবলীগ, ১৪০৫ হিজরী শামসীর জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

পৃথিবীর সকল নবী তওহীদ বা একত্ববাদ প্রতিষ্ঠার জন্য এসেছেন এবং তাঁরা নিজ নিজ জাতিকে এর শিক্ষা দিয়েছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ এই তওহীদকে জলাঞ্জলি দিয়েছে। মহানবী (সা.) একই বার্তা নিয়ে এসেছেন, একই কাজ অব্যাহত রাখার জন্য এসেছেন এবং নিজ অনুসারীদের মাঝে এই তওহীদের চেতনা সৃষ্টি করার জন্য এসেছেন। এ বিষয়ে তাঁর (সা.) যে মর্যাদা রয়েছে, তা অন্য কারো নেই। তিনি (সা.) যদি তওহীদ মেনে নেবার উপদেশ দিয়ে থাকেন, তবে আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে জ্ঞান লাভ করে তওহীদ গ্রহণের পক্ষে যুক্তি-প্রমাণও উপস্থাপন করেছেন।

তিনি (সা.) শিরকের বিরুদ্ধে যে জিহাদ করেছেন, তা নিছক অযৌক্তিকভাবে করেন নি; বরং শিরকের মন্দ দিকগুলো বুঝিয়েছেন এবং এর বিরুদ্ধে ঘৃণা সৃষ্টি করেছেন। আর তাঁর (সা.) অনুসারীরা নিজেদের কাজের মাধ্যমে প্রমাণ করেছেন, তওহীদের শিক্ষা এবং শিরকের প্রতি ঘৃণা তাদের শিরা-উপশিরায় মিশে গেছে। এর কারণ হলো, আল্লাহ্ তা'লা তাঁর (সা.) ওপর যে শিক্ষা অবতীর্ণ করেছেন তা এতই পূর্ণাঙ্গ ও কার্যকরী ছিল যে, এর কোনো সুযোগই ছিল না– কেউ এর গভীরতা অনুধাবন করার পরও তা থেকে দূরে সরে যাবে। তাঁর (সা.) এই শিক্ষা, যা তাঁর অনুসারীদের ওপর প্রভাব বিস্তার করেছিল, সেটির প্রভাব বিস্তারী হবার কারণ হলো– তাঁর নিজের প্রতিটি কথা ও কাজ ছিল এর বাস্তব প্রতিচ্ছবি; এবং এ বিষয়ে আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে (সা.) যে মহান শিক্ষা দিয়েছিলেন, তিনি নিজেই ছিলেন তার বাস্তব নমুনা।

তাঁর যদি কোনো চিন্তা থেকে থাকে তবে তা এটাই ছিল যে, অন্য জাতিরা যেভাবে নিজেদের নবীদেরকে সিজদাস্থলে পরিণত করেছে, মুসলিম উম্মাহর মাঝেও যেন এই ভয়ানক পাপের জন্ম না হয়। তাঁকে কখনো খোদা তা'লার সমকক্ষ হিসেবে দাঁড় করানো যেতে পারে– এ আশঙ্কায় তিনি খোদার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন। আর এ বিষয়ে তিনি উম্মতকেও নসীহত করেছেন যে, আমাকে কখনো শিরকের কারণ বানিও না। তোমাদের দৃষ্টি যেন খোদা তা'লা ব্যতীত অন্য কারো প্রতি নিবদ্ধ না হয়।

সাম্প্রতিক খুতবাগুলোতে আমি খোদাপ্রেম বা ইবাদতের যে উল্লেখ করেছি, তাতে বর্ণিত বিষয়গুলো বা এ প্রসঙ্গে মহানবী (সা.)-এর যে ঘটনাই তুলে ধরেছি, তা তওহীদের দিকেই পথনির্দেশ করে। অথবা এতে তওহীদ প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁর (সা.) একটি প্রবল উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়, একটি ব্যাকুলতা দেখা যায়। আর এটি একদিকে যেমন তওহীদ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তাঁর সর্বোচ্চ মর্যাদার প্রতিফলন ঘটায়, যা শৈশব থেকেই আল্লাহ্ তা'লা তাঁর মাঝে সৃষ্টি করেছিলেন, তেমনিভাবে তাঁর প্রতি অবতীর্ণ শিক্ষা– যা আল্লাহ্ তা'লার সর্বশেষ শিক্ষা এবং একটি পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা– তা থেকেও আমরা এর গভীরতা সম্পর্কে জানতে পারি। পবিত্র কুরআনে বার বার বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদেরকে তওহীদের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। যেমন আল্লাহ্ তা'লা সূরা আল-আম্বিয়াতে বলেন:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ (সূরা আল-আম্বিয়া: ২৬)

অর্থাৎ, **"আর আমরা তোমার পূর্বে যে রসূলই পাঠিয়েছি তার প্রতি আমরা (এই বলে) ওহী করতাম, 'নিশ্চয় আমি ছাড়া কোনো উপাস্য নাই। অতএব, আমারই ইবাদত করো।"**

আর এরপর ইবাদতের যে পদ্ধতি তাঁকে শেখানো হয়েছে এবং তওহীদের মর্যাদা প্রকৃত অর্থে প্রতিষ্ঠিত করে তিনি (সা.) যেভাবে ইবাদত করেছেন, অন্য কোনো ধর্মে এর শতভাগের একভাগও দেখা যায় না। এরপর আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে বলেন:

قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّينَ (সূরা আয-যুমার: ১২)

অর্থাৎ, **"তুমি বলো, 'নিশ্চয় আমাকে আদেশ দেওয়া হয়েছে, আমি যেন একমাত্র আল্লাহ্র প্রতি একনিষ্ঠ আনুগত্যের সাথে তাঁর ইবাদত করি।"**

সুতরাং, একজন প্রকৃত মুসলমানও যখন এটি পড়বে তখন সেও এই ঘোষণা করবে যে, আমাকে একনিষ্ঠ হয়ে আল্লাহ্ তা'লার ইবাদত করতে হবে, খাঁটি তওহীদ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করতে হবে এবং সেই আদর্শের ওপর চলতে হবে, যা মহানবী (সা.) এই ঘোষণার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা করেছেন, যার নির্দেশ পবিত্র কুরআনে দেওয়া হয়েছে। আমরা যদি খাঁটি একত্ববাদ প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি আমাদের ইবাদতের মানও উন্নত করি, তবেই আমরা এক বিপ্লব আনয়নকারী হতে পারব, নচেৎ এগুলো শুধুই মুখের কথা। আর তখনই আমরা প্রকৃত মুওয়াহহিদ (তথা একত্ববাদী) আখ্যায়িত হতে পারব। এরপর আল্লাহ্ তা'লা বলেন:

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا (সূরা আন-নিসা: ৩৭)

"আর তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত করো এবং কোনো কিছুকেই তাঁর শরীক কোরো না।"

অন্য এক স্থানে আল্লাহ্ তা'লা বলেন:

وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ (সূরা আল-বাকারা: ১৬৪)

অর্থাৎ, **"আর তোমাদের উপাস্য হলেন এক-অদ্বিতীয় উপাস্য। তিনি ছাড়া কোনো উপাস্য নাই– (যিনি) স্বতঃপ্রবৃত্ত দাতা, বার বার কৃপাকারী।"**

এরপর পবিত্র কুরআনের শেষ দিকে আল্লাহ্ তা'লা তাঁর তওহীদ প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দিয়ে বলেন:

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ (সূরা আল-ইখলাস: ২-৫)

অর্থাৎ, **"তুমি বলো, তিনিই আল্লাহ্, এক ও অদ্বিতীয়। আল্লাহ্ স্বয়ংসম্পূর্ণ ও সর্বনির্ভরস্থল। তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাঁকেও জন্ম দেওয়া হয়নি। আর তাঁর সমতুল্য অন্য কেউ নেই।"**

আল্লাহ্ তা'লা এখানে সব ধরনের শিরক খণ্ডনের ঘোষণা দিয়েছেন এবং মহানবী (সা.)-কে বলেছেন, পৃথিবীতে এটি ঘোষণা করে দাও। সুতরাং, আমরা তাঁর (সা.) অনুসারীরাও যখন এটি পড়ব, তখন আমাদেরও দায়িত্ব হলো এই খাঁটি তওহীদের ঘোষণা করা, যার ঘোষণা এই সূরায় দেওয়া হয়েছে এবং আরো অনেক স্থানে দেওয়া হয়েছে। আর নিজেদের কথা ও কাজের মাধ্যমে বিশ্ববাসীকে এটি জানিয়ে দেওয়া যে, আল্লাহ্ তা'লাই একক এবং তিনি সব কিছুর অমুখাপেক্ষী; বরং প্রতিটি বস্তুই তাঁর মুখাপেক্ষী। তিনি কারো পিতা নন, পুত্রও নন এবং তাঁর মতো কেউই হতে পারে না। এটি এমন এক ঘোষণা যা প্রতিটি ধর্মের বিকৃত শিক্ষাকে খণ্ডন করে এবং এটিই সেই শিক্ষা, যার ঘোষণার মাধ্যমে মানুষ আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য লাভ করতে পারে। আর এর সবচেয়ে উন্নত ও মহান আদর্শ হলেন আমাদের নেতা ও মনিব হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)।

তাঁর (সা.) জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত তওহীদ প্রতিষ্ঠার কাজে অতিবাহিত হয়েছে; বরং যেমনটি আমি বলেছি, শৈশব থেকেই খাঁটি তওহীদের জন্য আল্লাহ্ তা'লা তাঁর তরবিয়ত করেছিলেন। এগুলো পবিত্র কুরআন থেকে উদ্ধৃত আমার কয়েকটি দৃষ্টান্ত মাত্র, এমন বাণীতে তো পবিত্র কুরআন পরিপূর্ণ। আমি মহানবী (সা.)-এর জীবনচরিতেরও কিছু ঘটনা উপস্থাপন করছি, যার মাধ্যমে শৈশবকাল থেকে নবুওয়তের দাবি পর্যন্ত এবং জীবনভর তওহীদের জন্য তাঁর ব্যাকুলতা ও প্রচেষ্টা দেখা যায়।

মহানবী (সা.)-এর স্বভাব এতটাই পবিত্র ছিল যে, তওহীদের প্রতি ভালোবাসা তাঁর শিরা-উপশিরায় প্রোথিত ছিল এবং নবুওয়তের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হবার আগে থেকেই তাঁর প্রকৃতি শিরক ও মূর্তিপূজার প্রতি বীতশ্রদ্ধ ছিল। একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে, হযরত উম্মে আয়মান (রা.) বর্ণনা করতেন, **'বুওয়ানা'** এমন একটি প্রতিমা ছিল যাকে কুরাইশ খুব সম্মান করত। তারা এর কাছে উপস্থিত হয়ে কুরবানী করত এবং বছরে একদিন সেখানে ইতিকাফ করত। আবু তালিবও নিজের লোকদের নিয়ে সেখানে যেতেন এবং মহানবী (সা.)-কে সাথে নিয়ে যেতে চাইতেন, কিন্তু তিনি (সা.) অস্বীকৃতি জানাতেন। এমনকি একবার হুযূর (সা.)-এর ফুফুরা এবং আবু তালিব তাঁর প্রতি চরম অসন্তুষ্ট হন এবং বলতে থাকেন, হে মুহাম্মদ! তুমি কী চাও? তুমি কি তোমার সম্প্রদায়ের উৎসবে অংশ নিয়ে তাদের সমাবেশকে সমৃদ্ধ করবে না?

যাহোক, একবার তাঁর ফুফুদের পীড়াপীড়িতে তিনি (সা.) সেখানে তো গেলেন, কিন্তু চরম ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে ফিরে এলেন এবং বললেন, আমি সেখানে এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখেছি। ফুফুরা বললেন, এত নেক মানুষের ওপর শয়তান প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। তারা জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কী দেখেছ? তিনি (সা.) জানালেন, যখনই আমি মূর্তির কাছাকাছি যেতে উদ্যত হতাম, তখনই এক সাদা পোশাক পরিহিত ব্যক্তি চিৎকার করে বলত, হে মুহাম্মদ! পেছনে থাকো এবং এই মূর্তিকে স্পর্শ কোরো না। এরপর মহানবী (সা.) আর কখনো মুশরিকদের কোনো উৎসবে অংশগ্রহণ করেন নি এবং আল্লাহ্ তা'লা সবসময় তাঁকে এমন শিরকপূর্ণ প্রথা থেকে সুরক্ষিত রেখেছেন। এটি নবুওয়তের দাবির পূর্বের ঘটনা।

শৈশবে নিজ চাচা আবু তালিবের সাথে সিরিয়া সফরের সময় যখন বাহিরা নামক খ্রিষ্টান সন্ন্যাসীর সাথে সাক্ষাৎ হয়, তখন মহানবী (সা.) তার একটি প্রশ্নের জবাবে বলেছিলেন, আমাকে লাত ও উযযা মূর্তির বিষয়ে জিজ্ঞেস কোরো না। খোদার কসম! আমার কাছে এগুলোর চেয়ে অধিক ঘৃণ্য বস্তু আর কোনো কিছু নেই।

মহানবী (সা.) যখন হযরত খাদীজার (রা.) বাণিজ্যপণ্য নিয়ে সিরিয়া গিয়েছিলেন, তখন রসূলুল্লাহ্ (সা.) সেই পণ্য বিক্রি করেন এবং এর বদলে অন্য মালামাল ক্রয় করেন। সেই সময়ে একটি বিষয়ে তাঁর (সা.) এবং এক ব্যক্তির মাঝে মতবিরোধ দেখা দেয়। সেই ব্যক্তি বলে, লাত ও উযযার কসম খাও, তবেই আমি তোমার কথা মানব; এই কসম খাও, সাক্ষ্য দাও। তখন রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, আমি কখনোই এসব মূর্তির কসম খাই নি। আমি এগুলোর পাশ দিয়ে যাবার সময়ও মুখ ফিরিয়ে নিই, আর তুমি আমাকে বলছ কসম খেতে? এটি কীভাবে হতে পারে?

এই তওহীদের ভালোবাসায় তিনি (সা.) হেরা গুহায় যেতেন। এর উল্লেখ আগেও করা হয়েছে। সেখানে এক ও অদ্বিতীয় খোদার ইবাদত এবং তওহীদের জন্য তাঁর অন্তরে ব্যাকুলতা থাকত। হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) এক স্থানে এর চিত্র এভাবে তুলে ধরেছেন:

হেরা গুহা মক্কার পাহাড়গুলোর মাঝে হেরা নামক একটি সুপরিচিত পাহাড়ে অবস্থিত, যা মক্কা থেকে তিন মাইল দূরত্বে অবস্থিত। আজকাল একে জাবালে নূর বলা হয়। মহানবী (সা.)-এর মূর্তির প্রতি তো ঘৃণা ছিলই, তিনি (সা.) মূর্তিপূজারীদের এবং এক ও অদ্বিতীয় খোদা থেকে দূরে সরে যাওয়া লোকদের জন্যও আক্ষেপ করতেন। শুধু নিজের জন্যই নয়, বরং মানুষের জন্যও তাঁর আক্ষেপ ছিল যে, তারা কেন মূর্তিপূজা করে। আর নবুওয়ত লাভের পূর্বে লোকালয় থেকে দূরে এই গুহায় তিনি ইবাদত করতেন। মহানবী (সা.) যখন চল্লিশ বছর বয়সে উপনীত হন, তখন একদিন জিবরাঈল (আ.) আবির্ভূত হন এবং মহানবী (সা.)-এর ওপর সর্বপ্রথম ওহী অবতীর্ণ হয়, যার মাধ্যমে খোদা তা'লা তাঁকে (সা.) নবুওয়তের পদে অধিষ্ঠিত করেন। এই প্রথম ওহীর সাথে সাথেই মহানবী (সা.) মানুষকে আল্লাহ্ তা'লার একত্ববাদের প্রতি ডাকতে শুরু করেন এবং শিরকের বিরুদ্ধে শিক্ষা দিতে থাকেন। প্রাথমিক দিনগুলোতে তিনি (সা.) তাঁর এই মিশনের কথা প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন নি; বরং অত্যন্ত নীরবে কাজ শুরু করেন এবং কেবল নিজের পরিচিত গণ্ডির মাঝেই স্বীয় শিক্ষাকে সীমাবদ্ধ রাখেন।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, সত্য প্রকাশের ক্ষেত্রে আমাদের নবী (সা.) ছিলেন একজন সর্বশ্রেষ্ঠ মুজাদ্দিদ, যিনি হারিয়ে যাওয়া সত্যকে পুনরায় পৃথিবীতে ফিরিয়ে এনেছেন। এই গৌরবে আমাদের নবী (সা.)-এর কোনো সমকক্ষ নেই। তিনি সমগ্র বিশ্বকে এক অমানিশায় নিমজ্জিত পেয়েছিলেন এবং তারপর তাঁর আবির্ভাবে সেই অন্ধকার আলোতে রূপান্তরিত হয়েছিল। যে জাতির মাঝে তিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন, সেই সমগ্র জাতি শিরকের পোশাক ছুঁড়ে ফেলে তওহীদের পোশাক পরিধান না করা পর্যন্ত তিনি ইন্তেকাল করেন নি। আর কেবল এতটুকুই নয়, বরং তারা ঈমানের সর্বোচ্চ মর্যাদায় পৌঁছে গিয়েছিল এবং তাদের দ্বারা সততা, বিশ্বস্ততা ও দৃঢ় বিশ্বাসের এমন সব কাজ সম্পাদিত হয়েছিল, যার দৃষ্টান্ত পৃথিবীর কোথাও পাওয়া যায় না। এই সফলতা এবং এমন সফলতা মহানবী (সা.) ব্যতীত অন্য কোনো নবীর ভাগ্যে জোটে নি। এটিই মহানবী (সা.)-এর নবুওয়তের সত্যতার এক বিশাল প্রমাণ যে, তিনি এমন এক যুগে আবির্ভূত হয়েছিলেন যখন যুগ চরম অন্ধকারে নিপতিত ছিল এবং স্বভাবতই একজন মহান সংস্কারকের মুখাপেক্ষী ছিল। আর তারপর তিনি এমন এক সময়ে পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন যখন লক্ষ লক্ষ মানুষ শিরক ও মূর্তিপূজা ত্যাগ করে তওহীদ এবং সরল পথ অবলম্বন করে নিয়েছিল।

আর প্রকৃতপক্ষে এই পূর্ণাঙ্গ সংস্কার কেবল তাঁর সাথেই নির্দিষ্ট ছিল যে, তিনি এক বন্য প্রকৃতির ও পশুতুল্য জাতিকে মানবীয় শিষ্টাচার শিখিয়েছিলেন। অথবা অন্য কথায় এভাবে বলা যায় যে, তিনি পশুদের মানুষ বানিয়েছিলেন, এরপর মানুষদেরকে শিক্ষিত মানুষ বানিয়েছিলেন এবং শিক্ষিত মানুষদের খোদাভীরু মানুষে পরিণত করেছিলেন, তাদের মাঝে আধ্যাত্মিকতার চেতনা ফুঁকে দিয়েছিলেন এবং সত্য খোদার সাথে তাদের সম্পর্ক স্থাপন করে দিয়েছিলেন। তারা খোদার পথে ছাগলের মতো জবাই হয়েছে এবং পিপীলিকার মতো পদদলিত হয়েছে, কিন্তু ঈমানকে হাতছাড়া করে নি; বরং প্রতিটি বিপদে সামনের দিকে অগ্রসর হয়েছে।

সুতরাং, নিঃসন্দেহে আধ্যাত্মিকতা প্রতিষ্ঠার দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদের নবী (সা.) ছিলেন দ্বিতীয় আদম; বরং প্রকৃত আদম তিনিই ছিলেন, যাঁর মাধ্যমে ও যাঁর বদৌলতে সমস্ত মানবীয় গুণাবলি পূর্ণতায় পৌঁছেছিল এবং সমস্ত পুণ্যময় শক্তি আপন আপন কাজে নিয়োজিত হয়েছিল, আর মানব প্রকৃতির কোনো শাখাই ফলহীন থাকে নি। আর তাঁর ওপর নবুওয়তের

পরিসমাপ্তি শুধু শেষে আসার কারণেই হয় নি, বরং এই কারণেও হয়েছে যে, নবুওয়তের সমস্ত শ্রেষ্ঠত্ব তাঁর সত্তায় পরম মার্গে উপনীত হয়েছে।

তিনি (আ.) অপর এক স্থানে বলেন, হে খোদা! তোমার প্রতি হাজার হাজার শুকরিয়া যে, তুমি নিজেই আমাদেরকে তোমাকে চেনার পথ দেখিয়েছ এবং তোমার পবিত্র কিতাবসমূহ অবতীর্ণ করে চিন্তা ও বুদ্ধির ভুলভ্রান্তি এবং ত্রুটিবিচ্যুতি থেকে রক্ষা করেছ। আর দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক রসূলদের সরদার হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.) এবং তাঁর পরিবার-পরিজন ও সাহাবীদের প্রতি, যাঁর মাধ্যমে খোদা এক পথভ্রষ্ট বিশ্বকে সরল পথে পরিচালিত করেছেন; সেই অভিবাবক ও কল্যাণময় সত্তা– যিনি পথহারা সৃষ্টিকে পুনরায় সরল পথে ফিরিয়ে এনেছেন, সেই সৎকর্মশীল ও অনুগ্রহকারী– যিনি মানুষকে শিরক ও মূর্তিপূজার বিপদ থেকে মুক্ত করেছেন, অথবা সেই জ্যোতি ও জ্যোতিবিচ্ছুরণকারী– যিনি বিশ্বে তওহীদের আলো ছড়িয়ে দিয়েছেন, আর সেই প্রজ্ঞাবান ও যুগের চিকিৎসক– যিনি বিকৃত হৃদয়গুলোকে সত্যের ওপর দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত করেছেন, সেই দয়ালু ও অলৌকিক নিদর্শনের অধিকারী– যিনি মৃতদেরকে জীবনের সুধা পান করিয়েছেন, সেই অতিশয় দয়াবান ও কৃপাশীল– যিনি উম্মতের জন্য দুঃখ সয়েছেন এবং কষ্ট বরণ করেছেন, সেই বীর ও সাহসী– যিনি আমাদেরকে মৃত্যুর মুখ থেকে বের করে এনেছেন, সেই সহনশীল ও নিঃস্বার্থ মানুষ– যিনি দাসত্বে মাথা অবনত করেছেন এবং নিজের অস্তিত্বকে ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছেন, সেই পূর্ণাঙ্গ একত্ববাদী ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানের সাগর– যাঁর কেবল খোদার মহিমাই পছন্দ ছিল এবং অন্য সবাইকে নিজের দৃষ্টি থেকে সরিয়ে দিয়েছেন, করুণাময় খোদার কুদরতের সেই নিদর্শন– যিনি উম্মী বা নিরক্ষর হয়েও আধ্যাত্মিক জ্ঞানে সবার ওপর বিজয়ী হয়েছেন এবং প্রত্যেক জাতিকে তাদের ভুলভ্রান্তি ও ত্রুটির জন্য অভিযুক্ত করেছেন।

এরপর তিনি (আ.) অন্য এক স্থানে বলেন, আজ পৃথিবীর বুকে তওহীদ নামক বস্তুটি মহানবী (সা.)-এর উম্মত ব্যতীত অন্য কোনো সম্প্রদায়ের মাঝে পাওয়া যায় না। কুরআন শরীফ ব্যতীত অন্য এমন কোনো কিতাবের সন্ধান মেলে না, যা কোটি কোটি সৃষ্টিকে আল্লাহ্র একত্ববাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত করে এবং পরম সম্মানের সাথে সেই সত্য খোদার দিকে পথপ্রদর্শন করে। প্রত্যেক জাতি নিজেদের কৃত্রিম খোদা বানিয়ে নিয়েছে। মুসলমানদের খোদা তিনিই, যিনি অনাদিকাল থেকে আছেন। তিনি অবিনশ্বর ও অপরিবর্তনীয় এবং নিজের চিরন্তন গুণাবলিতে তেমনই আছেন, যেমনটি পূর্বে ছিলেন।

কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো, আজ উম্মতে মুহাম্মদীয়াও তওহীদের এই মর্যাদাকে ভুলে যাচ্ছে এবং তাদের মাঝে সেই প্রকৃত তওহীদ আর অবশিষ্ট নেই, যার শিক্ষা আল্লাহ্ তা'লা দিয়েছেন এবং বড়ো বেদনার সাথে যার উপদেশ ও দিকনির্দেশনা আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) প্রদান করেছেন। খাঁটি তওহীদকে ভুলে যাবার কারণে আল্লাহ্ তা'লার গুণাবলির প্রতিও সেই বিশুদ্ধ ঈমান আর অবশিষ্ট নেই, যা একজন মুসলমানের বৈশিষ্ট্য হওয়া উচিত। এমন অবস্থায় হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সত্যনিষ্ঠ দাসের (আ.) অনুসারীদের কর্তব্য হলো তওহীদের প্রকৃত অর্থ অনুধাবন করা এবং এজন্য নিজেদের মধ্যে বিশেষ পরিবর্তন আনয়ন করা। রমযান ইবাদতের বিশেষ মাস; এ মাসে বিশেষভাবে এ প্রচেষ্টা চালানো উচিত এবং এজন্য দোয়া করা প্রয়োজন। আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) তাঁর সমগ্র জীবন তওহীদ প্রতিষ্ঠার জন্য যেভাবে প্রচেষ্টা চালিয়েছেন– যদি আমরা তাঁর প্রতি ভালোবাসার দাবি করি, তবে আমাদেরও সে উদ্দেশ্যে বিশেষ প্রচেষ্টা চালাতে হবে। আল্লাহ্

তা’লার নির্দেশে তওহীদ প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি (সা.) কীভাবে চেষ্টা করেছেন এবং কত কষ্ট সহ্য করেছেন তা হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) একস্থানে এভাবে বর্ণনা করেছেন:

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা’লা রসূলে করীম (সা.)-কে বলেন,

وَأَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْأَقْرَبِيْنَ (সূরা আশ-শুআরা: ২১৫)

অর্থাৎ হে মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্! তুমি দুনিয়ার প্রান্তে প্রান্তে মানুষকে সতর্ক করো, কিন্তু প্রথমে তোমার নিকটাত্মীয়দের সতর্ক করো। কারণ তাদের ওপর তোমার দুটি অধিকার রয়েছে– একটি হলো, তারা অন্যদের মতোই ধ্বংসের পথে রয়েছে; আরেকটি হলো, তারা তোমার আত্মীয়স্বজন এবং তাদের পূর্বপুরুষরা তোমার সঙ্গে সদাচরণ করেছিল। ইংরেজিতেও একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, Charity begins at home অর্থাৎ দান-খয়রাত প্রথমে ঘর থেকেই শুরু হয়। একইভাবে ওয়ায-নসীহতের ধারাও সর্বদা ঘর থেকেই শুরু হওয়া উচিত। বস্তুত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.) এই নির্দেশ এভাবে পরিপালন করেন যে, তিনি (সা.) মক্কার প্রথা অনুযায়ী সাফা পাহাড়ে দাঁড়ান এবং বিভিন্ন গোত্রের নাম ধরে ধরে ডাকতে শুরু করেন। প্রথমে তিনি (সা.) আলে গালিবকে ডাকেন এবং তারা মসজিদে হারাম থেকে বের হয়ে সাফা পাহাড়ের পাদদেশে চলে আসে। তখন আবু লাহাব মহানবী (সা.)-কে বলে, আলে গালিব তো এসে গেছে, আপনার যা বলার আছে বলে ফেলুন। কিন্তু তিনি (সা.) আবু লাহাবের কথার প্রতি কোনো ভ্রূক্ষেপ করেন নি এবং লুয়াই গোত্রের লোকদের ডাক দেন।

তারা পৌঁছে গেলে আবু লাহাব আবারও বলে, এখন তো লুয়াই গোত্রও এসে গেছে, এখন তো আপনি বলুন– আপনি কী বলতে চান। কিন্তু মহানবী (সা.) তার কথা গ্রাহ্য করার যোগ্য মনে করেন নি এবং আলে মুররাকে ডাক দেন, ফলে তারাও এসে পড়ে। এরপর তিনি (সা.) আলে কিলাব এবং আলে কুসাইকে ডাকেন, এক পর্যায়ে প্রায় সবাই সমবেত হয়ে গেল। আর যারা নিজেরা আসতে পারে নি, তারাও নিজেদের দূত পাঠায় যেন সে জেনে গিয়ে তাদের খবর দেয়– আজ তাদেরকে কী উদ্দেশ্যে সমবেত করা হয়েছে।

যখন মক্কার সকল গোত্র কুরাইশসহ সমবেত হয়ে গেল, তখন রসূল করীম (সা.) তাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেওয়া শুরু করেন এবং বলেন, দেখো, আমি যদি তোমাদের বলি– এই পাহাড়ের পেছনে একটি বিশাল সেনাবাহিনী সমবেত হয়েছে যারা তোমাদের ওপর আক্রমণ করতে উদ্যত– তোমরা কি আমার এ কথা বিশ্বাস করবে? তারা বলে, কেন নয়! আমরা আপনার কথা অবশ্যই বিশ্বাস করব, কারণ আমরা সর্বদা আপনাকে সত্যবাদী পেয়েছি, সত্যনিষ্ঠ পেয়েছি।

মক্কার অবস্থা সম্পর্কে অবগত ব্যক্তিরা জানেন, রসূল করীম (সা.)-এর এই প্রশ্নটি প্রকৃতপক্ষে কোনো অসম্ভব বস্তুকে সম্ভব বলে মেনে নেবার দাবি করার মতো বিষয় ছিল। কারণ, মক্কাবাসীদের গবাদিপশু উপত্যকায় চরে বেড়াত এবং সেটি এমন একটি এলাকা যেখানে কোনো সেনাবাহিনীর লুকিয়ে থাকা অসম্ভব ব্যাপার। কিন্তু ওই লোকদের ওপর তাঁর (সা.) সত্যবাদিতার এতই প্রভাব ছিল যে, তারা বলে, আমাদের চোখ এ কথা স্বীকার না করলেও আমরা আপনার কথা অবশ্যই মেনে নেব, কারণ আপনার সত্যবাদিতা আমাদের কাছে সর্বজনস্বীকৃত।

যখন তারা রসূল করীম (সা.) সম্পর্কে একবাক্যে নিজেদের এই দৃঢ় বিশ্বাস ও আস্থা প্রকাশ করে তখন তিনি (সা.) বলেন, তাহলে শোনো! আমি তোমাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ

খবর দিচ্ছি আর খবরটি হলো, আমাকে আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে রসূল করে পাঠানো হয়েছে। সুতরাং আমি তোমাদের বলছি, তোমরা যদি আল্লাহ্ তা'লার শাস্তি থেকে সুরক্ষিত থাকতে চাও, তবে আমার অনুসরণ করো।

তিনি (সা.) এ কথা বলতেই আবু লাহাব উত্তেজিত হয়ে বলতে লাগল,

تَبًّا لَكَ سَائِرَ الْأَيَّامِ أَلِهٰذَا جَمَعْتَنَا؟

অর্থাৎ (নাউযুবিল্লাহ্,) তুমি ধ্বংস হও! এতটুকু কথার জন্যই তুমি আমাদেরকে একত্র করেছিলে? আর একইভাবে অন্যান্য লোকেরাও হাসিবিদ্রূপ করতে করতে ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। কিন্তু এই বিদ্রূপ ও বিরোধিতা তাঁকে তওহীদ প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা থেকে বিরত রাখতে পারে নি। তিনি (সা.) অনবরত এই চেষ্টাতেই রত ছিলেন।

যেমনটি আমি বর্ণনা করেছি, বিদ্রূপ করা হয়েছিল, এরপর তাঁর (সা.) বিরোধিতাও বেড়ে গিয়েছিল। তাঁর (সা.) বিরোধিতার ইতিহাসকে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) ঐতিহাসিক গ্রন্থাবলির আলোকে এভাবে বর্ণনা করেছেন:

মহানবী (সা.) যতটা মহান কাজ নিয়ে এসেছিলেন, তাঁর (সা.) বিরোধিতাও ঠিক ততটাই তীব্র হওয়া অবধারিত ছিল। কারণ তিনি (সা.) এমন এক যুগে আদিষ্ট হয়েছিলেন যখন অমানিশা ছিল অত্যন্ত প্রবল এবং আলোর আগমনে অন্ধকারের বাহিনীর সর্বশক্তি দিয়ে এর মোকাবিলা করা অবধারিত ছিল। বাস্তবে এমনটিই হয়েছিল, অতীতের সকল নবীর তুলনায় তাঁর (সা.) বিরোধিতা সবচেয়ে বেশি হয়েছিল।

এই বিরোধিতার বাহ্যিক কারণগুলোর মধ্যে একটি ছিল, কুরাইশ চরম পর্যায়ের মূর্তিপূজারী জাতি ছিল এবং মূর্তিদের প্রতি সম্মান ও ভালোবাসা তাদের অন্তরে এমনভাবে গেঁথে ছিল যে, এগুলোর বিরুদ্ধে একটি শব্দ শোনাও তাদের পক্ষে ছিল অসহনীয়। পবিত্র কা'বা ঘর, যা কেবল আল্লাহ্ তা'লার ইবাদতের জন্য নির্মাণ করা হয়েছিল, এই যালেমরা তাতেও শত শত মূর্তি জড়ো করে রেখেছিল এবং নিজেদের সমস্ত প্রয়োজনের জন্য এই মূর্তিগুলোরই মুখের দিকে চেয়ে থাকত। এরপর যখন ইসলাম এলো, তখন এর মূলনীতিই ছিল আল্লাহ্ তা'লার তওহীদ বা একত্ববাদ এবং স্পষ্ট নির্দেশ ছিল, কোনো মানুষ, গাছপালা, পাথর বা নক্ষত্র ইত্যাদির সামনে মাথা নত কোরো না।

وَاسْجُدُوْا لِلّٰهِ الَّذِيْ خَلَقَهُنَّ (সূরা হামীম আস-সাজদাহ্: ৩৮)

"বরং কেবল সেই সত্তার সামনেই মাথা নত করো, যিনি এসব জিনিস সৃষ্টি করেছেন।"

শুধু তা-ই নয়, বরং কুরাইশের মূর্তিগুলোকে তাদের বক্তব্য অনুসারে 'অবমাননাকর শব্দে' স্মরণ করা হতো এবং সেগুলোকে জাহান্নামের ইন্ধন সাব্যস্ত করা হতো। এসব কথা কুরাইশের সারা শরীরে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল এবং তারা একজোট হয়ে ইসলামকে নিশ্চিḭ করার জন্য দণ্ডায়মান হয়েছিল। আরো অনেক কারণ ছিল, কিন্তু এটিই ছিল প্রধান কারণ।

হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, একজন নবী বা রসূল খোদার পক্ষ থেকে প্রেরিত হন এবং তাঁর সম্প্রদায়কে লোকেরা যখন একটি কুশলী, সত্যবাদী, সাহসী এবং উন্নতিশীল দল হিসেবে দেখে, তখন তাঁর প্রতি সমসাময়িক জাতি ও সম্প্রদায়গুলোর অন্তরে অবশ্যই এক প্রকার বিদ্বেষ ও হিংসার সৃষ্টি হয়। বিশেষ করে, প্রতিটি ধর্মের আলেম ও গদিনশিনরা তো চরম বিদ্বেষ প্রকাশ করে থাকে; কারণ এই খোদাভক্ত ব্যক্তির আবির্ভাবে তাদের আয়-রোজগার ও প্রভাব-প্রতিপত্তিতে ঘাটতি দেখা দেয়। তাদের ছাত্র ও মুরিদরা

তাদের জাল থেকে বেরিয়ে আসতে শুরু করে, কারণ তারা সমস্ত ঈমানি, নৈতিক ও জ্ঞানগত গুণাবলি সেই ব্যক্তির মাঝেই দেখতে পায় যিনি খোদার পক্ষ থেকে আবির্ভূত হন। যেসব মুরিদ পুণ্যময় স্বভাবের ও পুণ্যবান হয়ে থাকে, তারা নিজেদের পীরদের ছেড়ে সেই খোদাপ্রেমিক মানুষের দিকে ছুটে আসে।

অতএব, বুদ্ধিমান ও বিবেকবান লোকেরা বুঝতে পারে, জ্ঞান, সম্মান, তাকওয়া ও ধার্মিকতার যে মর্যাদা এসব আলেমকে দেওয়া হয়েছিল, তারা এখন আর তার যোগ্য নয় এবং তাদেরকে 'নাজমুল উম্মাহ' (উম্মতের নক্ষত্র), 'শামসুল উম্মাহ' (উম্মতের সূর্য) এবং 'শায়খুল মাশায়েখ' ইত্যাদি যে-সব সম্মানসূচক উপাধি দেওয়া হয়েছিল, সেগুলো এখন আর তাদের জন্য মানানসই নয়। তাই এসব কারণে বুদ্ধিমান লোকেরা তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, কারণ তারা নিজেদের ঈমান নষ্ট করতে চায় না। পবিত্র প্রকৃতির মান্যকারীদের কাজ তো এটিই হয়ে থাকে। পরিশেষে, এসব ক্ষতির কারণে আলেম ও মাশায়েখদের দল অনোন্যপায় হয়ে সবসময় নবী ও রসূলদের প্রতি হিংসা করে এসেছে। এর কারণ হলো, খোদার নবী ও মামুরদের সময়ে এদের মুখোশ চরমভাবে উন্মোচিত হয়ে যায়। কেননা প্রকৃতপক্ষে তারা অসম্পূর্ণ হয়ে থাকে এবং আর তাদের মাঝে নূর অতি স্বল্পই থাকে, আর খোদার নবী ও সত্যবাদীদের প্রতি তাদের শত্রুতা কেবলই স্বার্থপরতামূলক হয়ে থাকে এবং সম্পূর্ণরূপে প্রবৃত্তির বশবর্তী হয়ে তারা ক্ষতিসাধনের ষড়যন্ত্র আঁটে; বরং অনেক সময় তারা নিজেদের অন্তরে এটি অনুভবও করে যে, তারা খোদার একজন পবিত্র হৃদয়ের বান্দাকে অন্যায়ভাবে কষ্ট দিয়ে খোদার ক্রোধের শিকার হয়েছে এবং তাদের সেসব কাজও– যা বিরোধিতামূলক ষড়যন্ত্রের উদ্দেশ্যে সর্বদা তাদের থেকে প্রকাশ পেতে থাকে– তা তাদের অন্তরের অপরাধী হবার বিষয়টিকে তাদের সামনে তুলে ধরতে থাকে; কিন্তু তারপরও হিংসার আগুনের দ্রুতগামী ইঞ্জিন তাদেরকে শত্রুতার গহ্বরের দিকে টেনে নিয়ে যায়।

এগুলোই ছিল সেই কারণ, যা মহানবী (সা.)-এর যুগে মুশরিক, ইহুদী এবং খ্রিষ্টান আলেমদেরকে কেবল সত্য গ্রহণ করা থেকেই বঞ্চিত রাখে নি, বরং চরম শত্রুতা করতেও প্ররোচিত করেছিল। অতএব, তারা কোনো উপায়ে ইসলামকে পৃথিবীর বুক থেকে মুছে ফেলার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। আর যেহেতু ইসলামের প্রাথমিক যুগে মুসলমানরা সংখ্যায় কম ছিল, তাই তাদের বিরোধীরা সেই অহংকারের বশবর্তী হয়ে– যা স্বভাবতই এমন সব সম্প্রদায়ের অন্তরে ও মনমস্তিষ্কে গেঁথে থাকে যারা ধনসম্পদ, সংখ্যা, সম্মান ও মর্যাদায় নিজেদেরকে অন্য সম্প্রদায়ের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করে– তৎকালীন মুসলমানদের অর্থাৎ সাহাবীদের সাথে চরম শত্রুতাপূর্ণ আচরণ করে। তারা চাইত না, এই ঐশী চারাগাছটি পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হোক; বরং তারা সেই সত্যবাদীদের ধ্বংস করার জন্য নিজেদের সর্বশক্তি নিয়োগ করছিল এবং কষ্ট দেবার কোনো সুযোগ তারা হাতছাড়া করে নি। আর তাদের ভয় ছিল, পাছে এই ধর্ম দৃঢ় হয়ে যায় এবং এরপর এর অগ্রগতি আমাদের ধর্ম ও জাতির ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তাই এই ভয়ের কারণেই, যা তাদের অন্তরে এক ভয়ঙ্কর রূপে বসে গিয়েছিল, তাদের পক্ষ থেকে চরম জবরদস্তিমূলক ও নিষ্ঠুর কর্মকাণ্ড সংঘটিত হয়েছিল এবং তারা বেদনাদায়ক উপায়ে অধিকাংশ মুসলমানকে শহীদ করেছিল। আর তেরো বছরের একটি দীর্ঘ যুগ ধরে তাদের পক্ষ থেকে এ ধরনের কার্যকলাপই অব্যাহত ছিল এবং অত্যন্ত নির্দয়ভাবে খোদার বিশ্বস্ত বান্দা ও মানবজাতির জন্য গৌরবস্বরূপ লোকদেরকে সেই দুষ্ট নরপশুদের তরবারির আঘাতে টুকরো টুকরো করা হয়েছিল। এতিম শিশু এবং অসহায় ও দরিদ্র নারীদেরকে রাস্তাঘাটে ও অলিগলিতে জবাই করা হয়েছিল। এত কিছুর পরও খোদা

তা'লার পক্ষ থেকে চূড়ান্তভাবে এই জোর তাগিদ ছিল যে, কোনোভাবেই মন্দের মোকাবিলা কোরো না। সেই মনোনীত সত্যবাদীরা এমনটিই করেছিলেন। অলিগলি তাঁদের রক্তে লাল হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু তারা 'উহ্' শব্দটি পর্যন্ত করেন নি এবং তাদেরকে কুরবানীর পশুর মতো জবাই করা হয়েছিল, কিন্তু তারা 'আহ্' শব্দটিও উচ্চারণ করেন নি।

মক্কার কাফিররা তওহীদের বার্তা প্রচার থেকে বিরত রাখার জন্য তাঁকে (সা.) ভয়ও দেখিয়েছে এবং প্রলোভনও দিয়েছে, কিন্তু তাঁর (সা.) উত্তর এটাই ছিল যে, পৃথিবীতে তওহীদ প্রতিষ্ঠাই তো আমার জীবনের লক্ষ্য, এজন্যই আল্লাহ্ তা'লা আমাকে পাঠিয়েছেন। এ বিষয়ে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) এক স্থানে লিখেছেন:

যখন বিরোধিতা তীব্র রূপ ধারণ করে এবং এদিকে রসূল করীম (সা.)ও তাঁর সাহাবীরা (রা.) দৃঢ়তার সাথে মক্কাবাসীদের কাছে খোদা তা'লার এই বার্তা পৌঁছাতে শুরু করেন যে, এই পৃথিবীর স্রষ্টা খোদা এক-অদ্বিতীয়, তিনি ব্যতীত অন্য কোনো উপাস্য নেই; যত নবী গত হয়েছেন তাঁরা সকলেই তাঁর তওহীদের ঘোষণা দিতেন এবং নিজ নিজ জাতিকে এই শিক্ষার দিকেই আহ্বান করতেন। তোমরা এক ও অদ্বিতীয় খোদার ওপর ঈমান আনো, এসব পাথরের মূর্তিগুলোকে পরিত্যাগ করো, কেননা এগুলো একেবারেই অকেজো এবং এদের কোনো শক্তি নেই। হে মক্কাবাসীরা! তোমরা কি দেখতে পাও না, এদের সামনে যেসব উপঢৌকন বা নৈবেদ্য রাখা হয়, যদি এর ওপর মাছির ঝাঁক এসে বসে, তবে এই মাছিগুলোকে তাড়ানোর শক্তিও এদের নেই। কেউ যদি এদের ওপর আক্রমণ করে তবে এরা নিজেদের রক্ষা করতে পারে না। যদি কেউ এদের কোনো প্রশ্ন করে তবে এরা উত্তর দিতে পারে না। কেউ যদি এদের কাছে সাহায্য চায় তবে এরা তাকে সাহায্য করতে পারে না। কিন্তু এক ও অদ্বিতীয় খোদা তো প্রার্থনাকারীদের প্রয়োজন পূর্ণ করেন, প্রশ্নকারীদের উত্তর দেন, সাহায্যপ্রার্থীদের সাহায্য করেন এবং নিজের শত্রুদের পরাস্ত করেন আর নিজ ইবাদতকারী বান্দাদেরকে মহান উন্নতি দান করেন। তাঁর কাছ থেকে এমন আলো আসে যা তাঁর উপাসকদের অন্তরকে আলোকিত করে দেয়। তাহলে তোমরা কেন এমন খোদাকে ছেড়ে প্রাণহীন প্রতিমার সামনে মাথা নত করছ এবং নিজেদের জীবন নষ্ট করছ? তোমরা কি দেখতে পাও না– খোদা তা'লার তওহীদকে বর্জন করার কারণে তোমাদের চিন্তাধারাও কলুষিত হয়েছে এবং অন্তরও অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে? তোমরা নানা ধরনের কুসংস্কারাচ্ছন্ন শিক্ষায় লিপ্ত আছো। অন্তরে কুসংস্কার জন্ম নিচ্ছে– তা কী কারণে? কারণ তোমরা তওহীদকে পরিত্যাগ করেছ। তোমাদের মাঝে হালাল ও হারামের পার্থক্যবোধ অবশিষ্ট নেই। ভালো ও মন্দের মাঝে তোমরা পার্থক্য করতে পারো না। তোমরা নিজ মায়েদের অসম্মান করো, নিজেদের বোন ও কন্যাদের ওপর অত্যাচার করো এবং তাদেরকে তাদের অধিকার দাও না। নিজ স্ত্রীদের সাথে তোমাদের আচরণ ভালো নয়। তোমরা এতিমদের অধিকার আত্মসাৎ করো এবং বিধবাদের সাথে খারাপ আচরণ করো, গরিব ও দুর্বলদের ওপর অত্যাচার করো এবং অন্যের অধিকার কেড়ে নিয়ে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চাও। মিথ্যা ও প্রতারণার আশ্রয় নিতে তোমাদের কোনো লজ্জা হয় না। চুরি ও ডাকাতির প্রতি তোমাদের কোনো ঘৃণা নেই। তোমাদের কাজ হলো জুয়া এবং মদে মত্ত থাকা। জ্ঞানার্জন এবং জাতীয় সেবার দিকে তোমাদের কোনো মনোযোগ নেই। এক ও অদ্বিতীয় খোদার সম্পর্কে আর কতকাল উদাসীন থাকবে? এসো, নিজেদের সংশোধন করো আর অন্যায় ছেড়ে দাও। এসব মন্দ তোমাদের মাঝে সৃষ্টি হয়েছে, এগুলোর সংশোধন করো।

আজও যারা এসব মন্দের ধারক রয়েছে, তা তওহীদ থেকে দূরে সরে যাবার কারণেই। যে-সব জাতির মাঝে এসব পাপ রয়েছে, যদিও তাদের মাঝে দু-একটি ভালো দিক থাকে, তবুও আমি যে-সব মন্দের কথা পড়ে শোনালাম তার অনেকগুলোই তাদের মাঝে বিদ্যমান। এর কারণ হলো, তারা তওহীদ থেকে দূরে সরে আছে; আর দুর্ভাগ্যবশত কিছু মুসলমানেরও একই অবস্থা।

এরপর তিনি [হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)] বলেন, খোদার নৈকট্য লাভের উপায় হলো, প্রত্যেক প্রাপক ব্যক্তিকে তার হক (অধিকার) প্রদান করো। এটি অত্যন্ত জরুরি বিষয়। খোদা যদি সম্পদ দিয়ে থাকেন, তবে দেশ ও জাতির সেবা এবং অসহায় ও গরিবদের উন্নতির জন্য তা ব্যয় করো। নারীদের সম্মান করো এবং তাদের অধিকার আদায় করো। এতিমদেরকে আল্লাহ্ তা'লার আমানত মনে করো এবং তাদের দেখাশোনা করাকে উচ্চস্তরের পুণ্য বলে গণ্য করো। বিধবাদের সহায় হও, পুণ্য ও তাকওয়া প্রতিষ্ঠা করো।

শুধু ন্যায় ও সুবিচারই নয়, বরং দয়া ও অনুগ্রহকে নিজেদের রীতি বানাও। [কেবল সুবিচার নয়, বরং দয়াও থাকতে হবে, অনুগ্রহও থাকতে হবে; এটিই একজন মু'মিনের জন্য শিক্ষা।] এই পৃথিবীতে তোমাদের আগমন যেন বৃথা না যায়। নিজেদের পেছনে ভালো কীর্তি রেখে যাও, যেন চিরস্থায়ী পুণ্যের বীজ বপন করা যায়। অধিকার আদায় করার মাঝে নয়, বরং ত্যাগ ও নিঃস্বার্থপরতার মাঝেই প্রকৃত সম্মান নিহিত। [শুধু অধিকার আদায় করার চেষ্টা কোরো না, বরং কুরবানী ও আত্মত্যাগও জরুরি।] অতএব তোমরা কুরবানী করো, খোদার নিকটবর্তী হও। খোদার বান্দাদের প্রতি নিঃস্বার্থ ব্যবহারের দৃষ্টান্ত স্থাপন করো যেন খোদার দরবারে তোমাদের অধিকার স্বীকৃত হয়।

এগুলোই হলো প্রকৃত তওহীদের ওপর প্রতিষ্ঠিত হবার জন্য নিদর্শন। এটিও তিনি (সা.) ঘোষণা করেছিলেন যে, নিঃসন্দেহে আমরা দুর্বল; কিন্তু আমাদের দুর্বলতার দিকে দেখো না। ঊর্ধ্বলোকে সত্যের রাজত্ব প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে। এখন মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর মাধ্যমে ন্যায়ের পাল্লা স্থাপন করা হবে এবং সুবিচার ও দয়ার রাজত্ব কায়েম করা হবে, যেখানে কারো ওপর যুলুম করা হবে না, ধর্মের ব্যাপারে কোনো হস্তক্ষেপ করা হবে না, নারী ও দাসদের ওপর যে-সব যুলুম হয়ে আসছে, তা মুছে ফেলা হবে এবং শয়তানের রাজত্বের স্থলে এক ও অদ্বিতীয় খোদার রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করা হবে।

যখন এই শিক্ষাগুলো বার বার মক্কাবাসীদের শোনানো আরম্ভ হলো এবং ভদ্র স্বভাবের লোকদের আকর্ষণ ইসলামের প্রতি বাড়তে লাগল, তখন একদিন মক্কার সরদাররা একত্রিত হয়ে তাঁর (সা.) চাচা আবু তালিবের কাছে এলো এবং তাঁকে বলল, আপনি আমাদের নেতা এবং আপনার কারণেই আমরা আপনার ভাতিজা মুহাম্মদকে (সা.) কিছু বলি নি। এখন আপনার সাথে আমাদের চূড়ান্ত ফয়সালা করার সময় এসে গেছে। হয় আপনি তাকে বোঝান এবং তার কাছে জিজ্ঞেস করুন– সে আসলে আমাদের কাছে কী চায়? আর তার আকাঙ্ক্ষা যদি সম্মান লাভের হয়, তবে আমরা তাকে আমাদের সরদার বানাতে প্রস্তুত আছি। যদি সে সম্পদের আকাঙ্ক্ষী হয়, তবে আমাদের প্রত্যেকেই নিজ সম্পদের কিছু অংশ তাকে দিতে প্রস্তুত আছি। যদি তার বিয়ের ইচ্ছা থাকে, তবে মক্কার যে মেয়েকেই তার পছন্দ হয়– সে তার নাম বলুক– আমরা তার সাথে তার বিয়ে দিতে প্রস্তুত আছি। এর বিনিময়ে আমরা তার কাছে কিছুই চাই না এবং কোনো কিছু থেকে বারণও করি না। আমরা শুধু এতটুকু চাই, সে যেন আমাদের প্রতিমাগুলোকে মন্দ বলা ছেড়ে দেয়। সে নির্দ্বিধায় বলুক– খোদা এক; কিন্তু এটি যেন না বলে যে, আমাদের মূর্তিগুলো মন্দ। সে যদি এতটুকু কথা মেনে নেয়, তবে তার

সাথে আমাদের আপোশ হয়ে যাবে। আপনি তাকে বোঝান এবং আমাদের প্রস্তাব গ্রহণে তাকে রাজি করান। নচেৎ দুটি বিষয়ের একটি হবে; হয় আপনাকে আপনার ভাতিজাকে ছাড়তে হবে, নতুবা আপনার জাতি আপনার নেতৃত্ব অস্বীকার করে আপনাকে পরিত্যাগ করবে।

আবু তালিবের জন্য এ কথাটি অত্যন্ত কষ্টদায়ক ছিল। আরবদের কাছে টাকা-পয়সা তো অল্পই থাকত, তাদের সমস্ত আনন্দ তাদের নেতৃত্বের মাঝেই নিহিত ছিল। সরদাররা জাতির জন্য বেঁচে থাকত এবং জাতি সরদারদের জন্য বেঁচে থাকত। এ কথা শুনে আবু তালিব অস্থির হয়ে পড়েন। মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে ডাকেন এবং বলেন, হে আমার ভাতিজা! আমার জাতি আমার কাছে এসেছিল এবং তারা আমাকে এই বার্তা দিয়েছে। আর একই সাথে তারা আমাকে এ কথাও বলে দিয়েছে যে, যদি তোমার ভাতিজা এসব কথার কোনো একটিতেও রাজি না হয়, তবে আমাদের পক্ষ থেকে সব ধরনের প্রস্তাবই দেওয়া হয়ে গেছে; আমরা জানিয়ে দিয়েছি যে, আমরা এই সব কিছু দিতে প্রস্তুত আছি। এরপরও সে যদি নিজের রীতিনীতি পরিহার না করে, তবে আপনার কাজ হলো তাকে ছেড়ে দেওয়া। আর যদি আপনি তাকে ছাড়তে প্রস্তুত না হন, তাহলে আমরা আপনার নেতৃত্ব অস্বীকার করে আপনাকে ছেড়ে দেবো।

আবু তালিব যখন এ কথা বলেন, তখন তাঁর চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে যায়। তাঁর অশ্রু দেখে রসূল করীম (সা.)-এর চোখেও পানি এসে যায় এবং তিনি (সা.) বলেন, হে আমার চাচা! আমি এ কথা বলছি না যে, আপনি আপনার জাতিকে ছেড়ে দিয়ে আমার সঙ্গে থাকুন। আপনি নিঃসন্দেহে আমার সঙ্গ পরিত্যাগ করুন এবং আপনার জাতির পক্ষ অবলম্বন করুন। কিন্তু আমি এক ও অদ্বিতীয় খোদার কসম খেয়ে বলছি! তারা যদি সূর্যকে আমার ডানে এবং চাঁদকে আমার বামে এনেও দাঁড় করিয়ে দেয়, তবুও আমি খোদা তা'লার তওহীদের প্রচার থেকে বিরত হতে পারব না। আমি আমার কাজে রত থাকব, যতক্ষণ না খোদা আমাকে মৃত্যু দান করেন। আপনি নিজের মঙ্গলের দিকে দৃষ্টি দিন।

ঈমান ও নিষ্ঠায় পরিপূর্ণ এই উত্তর আবু তালিবের চোখ খুলে দেবার জন্য যথেষ্ট ছিল। তিনি বুঝতে পারেন যে, যদিও আমি ঈমান আনার সৌভাগ্য লাভ করি নি, কিন্তু এরূপ ঈমানের দৃশ্য দেখার সৌভাগ্য পাওয়াটাই তো সব সম্পদের চেয়ে বড়ো সম্পদ! আর তিনি বলেন, হে আমার ভাতিজা! যাও এবং নিজের দায়িত্ব পালন করতে থাকো। জাতি যদি আমাকে ছেড়ে দিতে চায় তবে নির্দ্বিধায় ছেড়ে দিক; আমি তোমাকে পরিত্যাগ করব না।

তওহীদ প্রতিষ্ঠার জন্য মহানবী (সা.) মক্কার কাফিরদের পক্ষ থেকে সব ধরনের অত্যাচার ও নিপীড়ন সহ্য করেছেন এবং এই প্রেরণাই তিনি (সা.) তাঁর সাহাবীদের (রা.) মাঝেও সৃষ্টি করেছিলেন, যেমনটি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)ও লিখেছেন। তারা নিজেদের গর্দান কাটিয়েছেন, যার ফলস্বরূপ তাঁরা 'আহাদ, আহাদ' (এক, এক) ঘোষণা অব্যাহত রেখেছেন, একই সাথে যুলুম সহ্য করেছেন এবং নিজেদের জীবন কুরবানী করেছেন। মক্কার কাফিরদের যে-সব মন্দের কথা একটু আগে উল্লেখ করা হয়েছে, তা তাদের তওহীদ থেকে দূরে থাকার কারণে এবং শিরকের কারণেই সৃষ্টি হয়েছিল। আজও যে-সব জাতি এবং যে-সব মানুষের মাঝে এসব পাপ রয়েছে, তা তওহীদ থেকে দূরে থাকার কারণেই রয়েছে।

সুতরাং এমন পরিস্থিতিতে আমাদের কাজ হলো, আমরা যেন তওহীদের ঘোষণা করতে থাকি, এবং এই তওহীদের বার্তা যেমন পৌঁছাব, তেমনিভাবে নিজেদের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক অবস্থাতেও একটি স্পষ্ট পরিবর্তন আনার চেষ্টা করব। তবেই আমরা প্রকৃত

তওহীদ মান্যকারী এবং খোদা তা'লার নির্দেশ পালনকারী আখ্যায়িত হতে পারব। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এর তৌফিক দান করুন। (আমীন)

**(কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)**